সিরাজের মুর্শিদাবাদ

অমর সাহা

পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি জেলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ একটি জেলা হলেও এর রয়েছে আলাদা একটি বৈশিষ্ট্য; ঐতিহাসিক গুরুত্ব। এক সময় এই মুর্শিদাবাদ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী থাকলেও আজ কিন্তু এটি একটি জেলা। সদর অবশ্য বহরমপুর। তবে, সেকালের সেই রাজধানীর নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন আর কীর্তি এখনও ছড়িয়ে আছে মুর্শিদাবাদ জুড়ে। সেদিনে নবাবদের রাজ্যপাট ছিল লালবাগ ঘিরে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ব্রিটিশরা অবশ্য রাজধানী গড়েছিল বহরমপুরে। বহরমপুরই আজ মুর্শিদাবাদ জেলার সদর দপ্তর।

এই ঐতিহ্যের মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব আজ বাড়িয়ে দিয়েছে নবাব সিরাজউদ্দৌলা, সুবা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। এই মুর্শিদাবাদেই তিনি নিহত হয়েছিলেন নির্মমভাবে ঘাতকদের হাতে। তাই মুর্শিদাবাদকে আজও বলা হয় 'সিরাজের মুর্শিদাবাদ'। এখানেই শুয়ে আছেন তিনি চিরনিদ্রায়। শুয়ে আছেন মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। আবার বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর আলি খাঁরও ঠিকানা এই মুর্শিদাবাদ। তাই ইতিহাসের পাতায় আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে মুর্শিদাবাদের নাম; মুর্শিদাবাদের জয়-পরাজয় গাথা। আছে সিরাজের নাম। মুর্শিদকুলি খাঁর নাম, আলিবর্দী খাঁর নাম। এমনকি মীরজাফর আলি খাঁর নামও।

তাই আজও টানে মুর্শিদাবাদ লাখো লাখো মানুষকে; দেশ-বিদেশের পর্যটকদের। মানুষ এসে শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, নবাব আলিবর্দী খাঁ, নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে। আর ঘৃণা ছুড়ে দেয় বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর আলি খাঁর প্রতি। কারণ, এই মীরজাফর আলি খাঁর গভীর ষড়যন্ত্রে সেদিন সেই ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন মুর্শিদাবাদের অদূরে পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলার সূর্য।

মুর্শিদাবাদের এই ঐতিহাসিক কীর্তি দেখতে গেলে ফিরে তাকাতে হবে পেছনের দিকে। খুঁজতে হবে ওই কীর্তির পেছনের ইতিহাস। তবেই মুর্শিদাবাদ দেখা সার্থক হবে।

খোশবাগ : সিরাজউদ্দৌলার সমাধিস্থল

মুর্শিদাবাদের তাই মানুষের আকর্ষণ! পর্যটকরা আসেন ফি-বছর। ঘুরে ঘুরে দেখেন নবাবদের নানা কীর্তি। মুর্শিদাবাদের জেলা শহর বহরমপুরে পলাশীর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের নাম রাখা হয়েছে মোহনলাল-মীরমদন বাসটার্মিনাল'।

এবার আমরা মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক কীর্তি ও নিদর্শনকে দেখতে পারি বিভিন্নভাবে :

১. নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কীর্তি
২. নবাব সুজাউদ্দৌলার কীর্তি
৩. নবাব সরফরাজ খাঁর কীর্তি
৪. নবাব আলিবর্দী খাঁর কীর্তি
৫. নবাব সিরাজউদ্দৌলার কীর্তি
৬. নবাব মীরজাফর আলি খাঁর কীর্তি এবং
৭. অন্যান্য নবাব-নাজিমদের কীর্তি।

প্রথমে দেখা যাক, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কীর্তি। মুর্শিদকুলি খাঁর ঐতিহাসিক কীর্তি হল তাঁর গড়া কাটরা মসজিদ। এই মসজিদের সিঁড়ির নিচেই তিনি সমাহিত। মুর্শিদাবাদ শহরের উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত এই বিরাট কাটরা মসজিদ। মুর্শিদাবাদ রেলস্টেশনের কাছেই। মসজিদটি তৈরি হয়েছিল পবিত্র মক্কা মুয়াজ্জমা মসজিদের অনুকরণে। আছে মসজিদে মিনার, চৌবাচ্চা ও ইঁদারা। মসজিদের দুপ্রান্তে ছিল ৭০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট দুটি বিরাট গম্বুজ। মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ছিল ১৩০ ফুট এবং প্রস্থে ২৫ ফুট। সামনে উঁচু বেদিতে ছিল নামাজ পড়ার বিরাট জায়গা। মুর্শিদকুলি খাঁ মসজিদটি তৈরির ভার দিয়েছিলেন তার বিশ্বস্ত অনুচর ফরাস খাঁর ওপর। তিনি মাত্র দু'বছরের মধ্যে (১৭২৩-২৫) মসজিদের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন। মসজিদটিতে রয়েছে ৬৪টি গম্বুজ। মসজিদ নির্মাণের মাত্র বছরখানেক পর মুর্শিদকুলি খাঁ ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে সমাহিত করা হয় তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী মসজিদের প্রবেশপথের সিঁড়ির নিচে তারই জন্য নির্মিত কুঠুরিতে। আজও এখানে রয়েছে মুর্শিদকুলি খাঁর কবর। মানুষ আসে, শ্রদ্ধা জানায়।

মুর্শিদকুলি খাঁর তৈরি এই কাটরা মসজিদের গম্বুজে উঠে একসময় মুর্শিদাবাদ নগরী পুরো দেখা

যেত। মসজিদটির ভেতরে ছিল ছোট ছোট অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ। এতে ৭০০ কোরআন পাঠ, ফকির, মিসকিন, দরবেশ, এতিম থাকতে পারতেন। তারা বিনামূল্যে শাহীখানায় খেতে পারতেন। মসজিদের গম্বুজে উঠতে গেলে প্রতিটিতে ৬৭টি সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়। মসজিদটি কারুকার্যখচিত। কাটরা মসজিদ চত্বরে একসঙ্গে ২ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারতেন। মসজিদের কোনো কড়ি বরগা নেই।

নবাব মুর্শিদকুর্লি খাঁর ইচ্ছায় এখানে একটি বাজার স্থাপন করা হয়। কাটরা শব্দের অর্থ 'গঞ্জ' বা 'বাজার'। সেই থেকে কাটরা মসজিদ ইট সুরকি নির্মিত এই বিশাল মসজিদের কষ্টিপাথরের একটি ফলকে লেখা আছে : 'আরবের মহম্মদ উভয় জগতের গৌরব। যে ব্যক্তি তাঁর দ্বারের ধূলি হয়, তার মাথায় ধূলিবৃদ্ধি হোক।' কাটরা মসজিদে ঢোকার ৫টি প্রবেশ পথ আছে। প্রথম দরজাটি বড়। দু'পাশের দুটি দরজা প্রথম দরজাটির চেয়ে ছোট। তার চাইতে ছোট শেষের দরজা দুটি। মসজিদটি চারদিকে দেয়াল ঘেরা। মসজিদের বাইরের একেবারে পাশে একটি শিবমন্দিরও তৈরি করেছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। মন্দিরটি এখনো বিদ্যমান।

শেষ জীবনে মুর্শিদকুলি খাঁ একটু হতাশ হয়ে পড়েন। নির্মাণ করেন মসজিদ। এই মসজিদের সিঁড়ির নিচে তিনি কবরস্থ হবেন সেই নিয়তে তিনি সিঁড়ির নিচের প্রকোষ্ঠে জায়গাও রাখেন। মৃত্যুর পর তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়।

এই মসজিদে ওঠার নিচে নৌসের বানু বেগমের সমাধি। মসজিদটি এখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত।

এই কাটরা মসজিদের অদূরে তোপখানা অবস্থিত। মুর্শিদকুলি খাঁ এখানে স্থাপন করেন অস্ত্রাগার বা তোপখানা। এখনও এখানে রয়েছে সেই 'বিশ্বধ্বংসী' জাহানকেষা কামানটি। শোনা যায়, মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থাপন করার সময় ওই কামানটি এখানে নিয়ে আসেন। ঢাকার বিখ্যাত জনার্দন কর্মকার এটি নির্মাণ করেন। এর দৈর্ঘ্য ৫.৫০ মিটার, বেড় প্রায় ১.৭০ মিটার, ওজন অনুমান ৭ হাজার ৯০০ কেজি। মোগল সম্রাট শাহজাহানের সময় এটি নির্মিত হয় (১০৪৭ হিজরি)। এই কামানটি দাগাবার জন্য ৩০ কেজি বারুদের প্রয়োজন হত। এখনও এই কামানটি দেখতে পাওয়া যায়। এটি রাখা হয়েছে একটি উঁচু বেদির ওপর। কামানটি অষ্টধাতুর তৈরি। সোনা, রুপা, তামা, সীসা, লোহা, পারদ টিন ও দস্তা দ্বারা তৈরি। এই মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়া টাকশালে মুদ্রাও তৈরি হত। লাহোর টাকশালে সুরক্ষিত রয়েছে ১৭৭৯ সালের মুদ্রিত মুদ্রাও। টাকশাল ছিল ওই তোপখানার সন্নিকটে।

কীর্তি রয়েছে আজিমুন্নেছা বেগমের। আজিমুন্নেছা ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যা। তার স্বামী ছিলেন সুজাউদ্দৌলা। সুজাউদ্দৌলা ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত, যদিও তাঁর জন্ম ভারতে। তিনি ছিলেন দারুণ অতিথিপরায়ণ, উদার, দরিদ্রবৎসল। শোনা যায়, তিন যখন ঈদের নামাজ পড়তে যেতেনি তখন হাতির পিঠে নিয়ে যেতেন বস্তায় ভরে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা। দান করতেন গরিবদের। এই দানশীল নবাবের স্ত্রী আজিমুন্নেছা 'কলজে খাকি' নামে ইতিহাসের পাতায় আজও ঠাঁই করে আছেন। মুর্শিদাবাদে রয়েছে তাঁর জীবন্ত সমাধি। এই জীবন্ত সমাধি মীরজাফরের প্রাসাদের সন্নিকটে। শোনা যায়, আজিমুন্নেছা একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে চিকিৎসা করেন ফকির খাদেম ফাইবাহার। ফকির তাকে উপদেশ দেন, গাছের শেকড়ের সঙ্গে শিশুদের কলজে দিয়ে তৈরি ওষুধ খেলেই তিনি রোগ থেকে মুক্তি পাবেন। সেই মতে নাকি আজিমুন্নেছা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে শিশুদের কলজে যোগাড় করে ওষুধ বানিয়ে খেতে লাগলেন। এতে তিনি নাকি রোগমুক্তি পান। পরে নাকি আজিমুন্নেছা কলজের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। ঘটনাটি একসময় তাঁর স্বামী নবাব

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমাধি

সুজাউদ্দৌলা জেনে ফেলেন। তখন সুজাউদ্দৌলা উড়িষ্যার নায়েব-সুবেদার ছিলেন। তিনি নরহত্যার এই অভিযোগের জন্য স্ত্রীকে জীবন্ত সমাধি দেওয়ার আদেশ দেন এবং পাপমুক্তির জন্য তাঁর কবরের ওপর তৈরি করেন মসজিদ।

হাজারদুয়ারি প্রাসাদের প্রায় বিপরীত দিকে ভাগীরথী নদীর অপর পাড়ে সুজাউদ্দৌলা তৈরি করেছিলেন স্বপ্নের এই রোশনীবাগ। আলো ও ফোয়ারা দিয়ে সাজিয়েছিলেন এটি। এখানে বসত নাচ ও গানের আসর। যদিও অনেকের মতে, এটি তৈরি করান নবাব আলিবর্দী খাঁ। এই রোশনীবাগেই সমাধিস্থ করা হয় নবাব সুজাউদ্দৌলাকে। এখানে রয়েছে সেই ঐতিহাসিক মসজিদটি। এছাড়া আর কিছুই নেই এখানে।

মুর্শিদাবাদে রয়েছে নবাব সরফরাজ খাঁর তৈরি ফুটি মসজিদ বা ফৌতি মসজিদ। কাটরা মসজিদের পশ্চিমদিকে রেললাইনের পাশে এটি অবস্থিত।

মুর্শিদাবাদের জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ আজ নিমকহারাম দেউড়ি হিসেবে পরিচিত। এটিই ছিল মীরজাফরের প্রাসাদ। যদিও এটি নির্মাণ করেন নবাব আলিবর্দী খাঁ। ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে এটি নির্মিত হয়। বর্তমানে এই প্রাসাদের জীর্ণদশা। শোনা যায়, ১৮৯৭ সালে এক ভূমিকম্পে এই প্রাসাদ ভেঙে পড়ে। এই প্রাসাদেরই একটি কক্ষে মীরজাফর-পুত্র মীরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ হত্যা করেছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে। অবশ্য এই হত্যা সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে। কারও কারও মতে, এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল মনসুরগঞ্জের 'হীরাঝিল' প্রাসাদে। তবে, জাফরাগঞ্জে মীরজাফরের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখা যাবে সিরাজ হত্যার সেই বধ্যভূমিকে।

নবাব হওয়ার পর মীরজাফর অবশ্য জ্যেষ্ঠপুত্র মীরনকে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ প্রদান করেছিলেন। মীরনের বংশধরেরাই জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে বাস করেছেন। জাফরাগঞ্জ ছিল মুর্শিদাবাদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এই জাফরাগঞ্জের নবাবেরা সরকারের নিকট হতে বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা বৃত্তি পেত।

জাফরাগঞ্জে যেমন ছিল মীরজাফরের প্রাসাদ, তেমনি মতিঝিলে ছিল ঘসেটি বেগমের প্রাসাদ। ঘসেটি বেগম ছিলেন আলিবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা। ঘসেটি বেগমের স্বামী ছিলেন নওয়াজিশ মহম্মদ খাঁ। ঢাকার শাসনকর্তা। তিনিই তৈরি করে দেন তার প্রিয়তমা পত্নী ঘসেটি বেগমের জন্য এই স্বপ্নের প্রাসাদ। মতিঝিল প্রাসাদ। ৭৫০ একর জমির ওপর এটি নির্মিত। এই প্রাসাদ নাকি তৈরি করা হয় পূর্ববঙ্গের লুট করা টাকা আর খাজনা দিয়ে।

মুর্শিদাবাদের কেন্দ্রস্থল লালবাগের দু'কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মতিঝিল প্রাসাদ। প্রাসাদটি তৈরি করা হয়েছিল ক্ষুরাকৃতি অর্থাৎ ইউ (ট) আকৃতিতে। একটি ঝিলের মধ্যে। ঝিলটি এখনও বর্তমান। এখানে শায়িত রয়েছেন নবাব নওয়াজেশ মহম্মদ খাঁ। পাশে রয়েছেন তারই পালিত পুত্র একরামউদ্দৌলা। এখানে রয়েছে একরামউদ্দৌলার টিউটর শমসের আলি ও দাইমার কবরও। তবে ঘসেটি বেগমের কবর নেই এখানে। তাকে সমাধিস্থ করা হয় খোশবাগে। মতিঝিলে আরও রয়েছে ইংরেজদের মধ্যে কামান দাগানো এক সেনার ৫ বছরের শিশুপুত্রের সমাধি। নাম ইয়োয়ান কিটিং।

হীরাঝিল ছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রাসাদ। মতিঝিলের ঘসেটি বেগমের প্রাসাদের গরিমা ও সৌন্দর্য দেখে তাকে টেক্কা দেওয়ার জন্য তৈরি করেছিলেন হীরাঝিল। জাফরাগঞ্জের বিপরীত দিকে ভাগীরথী নদীর পশ্চিমপাড়ে। আজ হীরাঝিল নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ক'বছর আগেও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখ যেত। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধ দেওয়ার পর নদীর জল ছেড়ে দেওয়ায় ভাগীরথী জলের প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় ডুবে যায় সিরাজের সাধের

প্রাসাদ হীরাঝিলের শেষ চিহ্নটুকুও।

হীরাঝিলের অস্তিত্ব না থাকলেও এখন সিরাজউদ্দৌলার কীর্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে মদিনা মসজিদ। হাজারদুয়ারি ও ইমামবাড়ার মাঝখানে; বিশাল মাঠের মধ্যে। তৎকালীন স্থাপত্যশিল্পের এটিই ছিল একটি অন্যতম নিদর্শন। সিরাজ নিজে এই মদিনা মসজিদের জন্য কারবালা হতে মাটি আনান। তারপর ওই মাটি রাখা হয় ত্রিপোলিয়া গেটের কাছে মুর্শিদকুলি খাঁর বেগমের সমাধির কাছে। তারপর সিরাজ খালি পায়ে সোনার ঝুড়িতে করে বয়ে নিয়ে আসেন এই মাটি মসজিদ-নির্মাণস্থলে। সেই মাটি দিয়ে তৈরি হয় মসজিদ- 'মদিনা মসজিদ'। শোনা যায়, সিরাজের মা আমিনা বেগম নাকি মানত করেছিলেন, সিরাজ নবাব হলে মদিনা থেকে মাটি এনে মসজিদ করবেন। বহু মূল্যবান রত্ন দিয়ে বানাবেন দরজা। ঠিকই মসজিদের দরজাটি ছিল বহু মূল্যবান রত্নখচিত। অবশ্য এখন আর সেই মূল্যবান পাথর নেই। শোনা যায় নবাব মীরকাশিম যখন মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী বিহারের মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন তখন নাকি এর ধনরত্ন মুঙ্গেরে নিয়ে যান। এই মসজিদের দরজা কেবল মহররম-এর সময় খোলা হয়। বাকি সময় বন্ধ থাকে।

এই মদিনা মসজিদের কাছে সিরাজউদ্দৌলা নির্মাণ করেছিলেন ইমামবাড়া। এটি অবশ্য কাঠের নির্মিত ছিল। আজ এটি নেই। ১৮৪৬ সালে সিরাজের কাঠের তৈরি ইমামবাড়াটি এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়ে যায়। পরে অবশ্য শেষ নবাব-নাজিম ফেরাদুনজা ১৮৪৭ সালে ৭ লাখ টাকা ব্যয় করে তার ৪ হাজার রাজমিস্ত্রি ও শ্রমিকদের নিয়ে এই ইমামবাড়াটি পুনঃনির্মাণ করেন। এটি ২০৭ মিটার লম্বা। সিরাজের এসব কীর্তি ছাড়া অন্য আর কোনো কীর্তি নেই মুর্শিদাবাদে। আছে শুধু ইতিহাস।

সেই ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে সিরাজ এখনও জীবন্ত। ঘুমিয়ে আছেন খোশবাগে। খোশবাগ লালবাগ নদীর খেয়াপার হয়ে ২ কিলোমিটার গেলেই মিলবে। ভাগীরথী নদীর অপর তীরে। আলিবর্দী খাঁ জীবদ্দশায় নিজ সমাধির জন্য তৈরি করেছিলেন এই খোশবাগ। এটি চতুর্দিক উঁচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ছিল খোশবাগে নানা ফুল ও বৃক্ষরাজি। আগে খোশবাগের নাম ছিল 'খুশবুবাগ' বা 'সুগন্ধী' বাগান। তখন নানা ফুলের সুগন্ধে ভরে যেত বাগান! এখন নাম হয়েছে 'খোশবাগ'। এখানেই রয়েছে নবাব আলিবর্দী খাঁর কবর। রয়েছে সুন্দর একটি মসজিদ। মসজিদের সামনে রয়েছে বিরাট জলের আধার। ওজু করার স্থান। দেখার মতো এগুলো।

খোশবাগে রয়েছে মেয়েদেরও একটি পৃথক সমাধিস্থল। নবাব আলিবর্দী খাঁ ও সিরাজউদ্দৌলা খোশবাগের যে স্থানে শায়িত তা একটি সুরক্ষিত দালানের মধ্যে। এই একই গৃহে আরও শুয়ে আছেন সিরাজের স্ত্রী লুৎফা বেগম, মোহনলালের বোন আলেয়া বেগম, সিরাজের কন্যা উম্মে জহুরা। লুৎফা শুয়ে আছেন সিরাজের পদতলে। আর আলিবর্দী খাঁর পদতলে শুয়ে আছেন সিরাজ কন্যা উম্মে জহুরা। এই সমাধিভবনের অন্যদিকে মসজিদ। সামনে রয়েছে আলিবর্দী খাঁর তিন চাকরের সমাধি। এখানেই রয়েছে কুখ্যাত দানশা ফকিরের কবরও। দানশা ফকিরই ধরিয়ে দিয়েছিল সিরাজকে। তবে এই কবরটি খোলা মাঠের মধ্যে অযত্নে পড়ে আছে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, এই দানশা ফকির একদিন ব্রিটিশের বিচারে মৃত্যুদণ্ড পেয়েছিল। খোলামাঠে রয়েছে দানশা ফকিরের আরও দু'আত্মীয়ের কবর।

এই খোশবাগে একটি উঁচু বেদির ওপর অজ্ঞাত ১৭টি সমাধি। শোনা যায়, এই ১৭ জনকে নাকি বিষ খাইয়ে হত্যা করেছিল মীরজাফর।

সিরাজদের সমাধিক্ষেত্রের ন্যায় মীরজাফরদের ছিল একটি সমাধিক্ষেত্র। মীরজাফরের জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের কাছেই এটি এখন বিশাল সমাধিক্ষেত্র। এখানেই শুয়ে আছে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরসহ তাদের বংশধরেরা। মীরন ও মীরকাশিম বাদে তার সব নবাব-নাজিম ও তাদের পরিবারবর্গের কবর রয়েছে এখানে। জাফরাগঞ্জ মোকবারা নামে এটি পরিচিত। প্রথমে অবশ্য এই সমাধিক্ষেত্রটি জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের 'কিচেন গার্ডেন' (করঃপযবহ মধৎফবহ) বা শাকসবজির বাগান নামে পরিচিত ছিল। মীরজাফরের স্ত্রী শাহ খানম এই বাগানটিকে দারুণ পছন্দ করতেন। পরে এটি মীরজাফরদের পারিবারিক কবরস্থানে রূপান্তরিত করা হয়। এখানে মীরজাফরও শুয়ে আছেন। শুয়ে আছেন তার স্ত্রীরাও। কেবল নেই মীরজাফরের পুত্র মীরন। মীরন ছিলেন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। শোনা যায়, বিহারের বক্সারের যুদ্ধে ব্রিটিশের হাতে মীরন গুরুতর আহত হন এবং সেনাশিবিরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। আবার কথিত আছে মীরন নাকি বজ্রাঘাতে মারা যান। মীরনের মৃত্যুতে মীরজাফর দারুণভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। এই মীরনেরই কেবল সমাধি নেই জাফরাগঞ্জের মোকবারায়। এখন এখানে রয়েছে প্রায় ১১শ' কবর। আছে এখানে নবাব-নাজিমদের কবর। এমনকি নবাবদের প্রিয় 'পায়রা'র কবরও।

মীরজাফর বিয়ে করেছিলেন দু'বাইজিকেও। এর একজন ছিলেন মুন্নিবাই ও অন্যজন ছিলেন বাব্বুবাই। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে কিন্তু মুন্নিবাই বা মুন্নি বেগম এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে আজও। প্রকৃতপক্ষে, মীরজাফরের প্রথমা স্ত্রী শাহ খানমের একমাত্র গর্ভজাত পুত্র মীরন মারা যাওয়ায় নবাবের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন তারই একমাত্র কন্যা ফাতেমা বেগম জামাতা মীরকাশিম। মীরকাশিম ইংরেজ কর্তৃক বিতাড়িত হওয়ার পর কিন্তু মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিম পরিবারের হাল ধরেছিলেন মুন্নি বেগমের পুত্রদ্বয়। প্রথমে নাজমুদ্দৌলা ও পরে সাইফুদ্দৌলা। এদের পরে আবার হাল ধরেন তৃতীয় স্ত্রী বাব্বু বেগমের পুত্র মোবারকউদ্দৌলা এবং তারই ওয়ারিশরা। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জাও ছিলেন ওই বাব্বু বেগমের বংশধর। বাব্বু বেগমের বংশধরেরা ১৭৭০ থেকে ১৮৩১ সাল পর্যন্ত বংশপরম্পরায় নবাব-নাজিম থেকে মুর্শিদাবাদ শাসন করে গেছেন।

১৭৬৫ সালে মীরজাফরের মৃত্যুর পর মুন্নি বেগম মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে দারুণভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন ইংরেজদের সমর্থক। ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় তিনি বিশেষভাবে সাহায্যও করেছিলেন। এ জন্য ইংরেজরা খুশি হয়ে তাঁকে 'মাদার ইন্ডিয়া' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মুন্নি বেগম মারা গেলে তার মৃত্যুসংবাদ শোনার পর গভর্নর জেনারেল নাকি নির্দেশ দিয়েছিলেন তার আত্মার শান্তি ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য ফোর্ট উইলিয়ামে তোপধ্বনি করার। এ দেশের কোনো মহিলাকে এভাবে সম্মান দেওয়া হয়নি, যেমনটা পেয়েছিলেন মুন্নি বেগম।

মুন্নি বেগম মুর্শিদাবাদের ধনসম্পত্তির একটা বিরাট অংশ পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন দানশীল মহিলা। দেওয়ালি উৎসবে ৬ হাজার এবং হোলি উৎসবে নাকি খরচ করতেন ৩৭ হাজার টাকা। ইংরেজরাও তাঁকে দান করার জন্য বছরে ১ লাখ টাকা দিতেন। তিনিই তৈরি করেন চক মসজিদ,

মুর্শিদাবাদ মসনদে সমাসীন নবাব-নাজিমদের ধারাবাহিক তালিকা

নাম	সময়	সম্পর্ক
মুর্শিদকুলি খাঁ	১৭০৬-২৫	মুর্শিদাবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা
সুজাউদ্দৌলা	১৭২৫-৩৯	'ঐ জামাতা
সরফরাজ খাঁ	১৭৩৯-৪১	ঐ পুত্র
আলিবর্দী খাঁ	১৭৪১-৫৬	পূর্ব পাটনার শাসনকর্তা
সিরাজউদ্দৌলা	১৭৫৬-৫৭	ঐ দৌহিত্র
মীরজাফর আলি খাঁ	১৭৫৭-৬০	আলিবর্দীর ভগ্নিপতি
মীর কাশিম	১৭৬০-৬৩	মীরজাফরের জামাতা
মীরজাফর আলি খাঁ	১৭৬৩-৬৫	আলিবর্দী খাঁর ভগ্নিপতি
নাজমুদ্দৌলা	১৭৬৫-৬৬	মীরজাফরের দ্বিতীয় পুত্র
সাইফুদ্দৌলা	১৭৬৬-৭০	মীরজাফরের তৃতীয় পুত্র
মোবারকউদ্দৌলা	১৭৭০-৯৩	মীরজাফরের চতুর্থপুত্র
বাবর আলি	১৭৯৩-১৮১০	মীরজাফরের পুত্র
আলিজা	১৮১০-২১	বাবর আলির জ্যেষ্ঠ পুত্র
ওয়ালাজা	১৮২১-২৪	আলিজার ভ্রাতা
হুমায়ুনজা	১৮২৪-৩৮	ওয়ালাজার পুত্র
ফেরাদুনজা	১৮৩৮-৮১	হুমায়ুনজার পুত্র
হাসান আলি	১৮৮১-১৯০৬	ফেরাদুনজার পুত্র
ওয়াশেখ আলি	১৯০৬-৫৯	হাসান আলির পুত্র
ওয়ারিশ আলি	১৯৫৯-৬৯	ওয়াশেখ আলির পুত্র

নবাব বাহাদুর স্কুল। আজও মুন্নি বেগমের এই দুটি নিদর্শন মুর্শিদাবাদের নজর কাড়ে। তিনিই মীরনের পুত্রদের নবাব-নাজিম হওয়ার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়ে লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে কলকাতা কাউন্সিলের অনুমোদন নিয়ে তার গর্ভজাত পুত্র নাজমুদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসান। এই নাজমুদ্দৌলার সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের নিকট হতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ক্লাইভ নাজমুদ্দৌলার সঙ্গে মতিঝিলে মহাসমারোহে ১৭৬৬ সালে প্রথম অভিষেক করেছিলেন। কিছুদিন পর নাজমুদ্দৌলা মারা যান। নবাব হন মুন্নি বেগমের পুত্র সাইফুদ্দৌলা। তখন আবার গভর্নর ভের্লেস্ট সাইফুদ্দৌলার সঙ্গে মহাসমারোহে দ্বিতীয় অভিষেক করেছিলেন। বেশিদিন থাকতে পারেননি নবাব সাইফুদ্দৌলা। রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক বসন্ত রোগ। সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান সাইফুদ্দৌলা। এরপরে মীরজাফরের তৃতীয় পত্নী বাব্বু বেগমের গর্ভজাত পুত্র মোবারকউদ্দৌলা মাত্র ১৩ বছর বয়সে নবাব হন।

মুন্নি বেগমের কীর্তি চক মসজিদ আজ ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এটি তৈরি হয় ১৭৫১ সালে। লম্বায় ১২৫ ফুট ও চওড়ায় ১৫ ফুট ছিল। দরজাটি ছিল প্রায় ১১ ফুট উঁচু। মসজিদের মেঝে ছিল কালো পাথর দ্বারা আবৃত। সামনে চৌবাচ্চা- ওজু করা জন্য। রয়েছে ৭টি গম্বুজ। এই মসজিদে শিয়া এবং সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজন নামাজ পড়তেন।

মীরজাফর নবাবী থেকে প্রথমবার গদিচ্যুত হয়ে জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হলে মুন্নি বেগম এই মসজিদে এসে কিছুদিন বসবাস করেন। শোনা যায়, সেকালের নর্তকি মুন্নি বেগমের সঙ্গে একজন শ্রেষ্ঠ বীণাবাদক এসেছিলেন।

তার নাম ওয়াজেদ আলি। মুন্নি বেগম ওই বীণাবাদকের বীণা শুনে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি ওই মসজিদ তারই নামে দান করেন। বীণাবাদক দীর্ঘদিন এই মসজিদে ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁকে সমাহিত করা হয় মসজিদের পাশেই। আর মুন্নি বেগমকে সমাহিত করা হয় জাফরাগঞ্জ মোকবারায়।

এই মুন্নি বেগম গদিনশীন বেগমের মর্যাদাও পেয়েছিলেন। এজন্য পেতেন বার্ষিক ১ লাখ টাকা। এই টাকা তিনি সঞ্চয় করতেন। সেই টাকার সুদ থেকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নবাব মাদ্রাসা। আজকের নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশন। ১৯১০ সাল পর্যন্ত ওই স্কুলে বিনা পয়সায় পড়বার অধিকার ছিল একমাত্র নবাব বংশীয়দের। স্কুলের সামনে ছিল 'টিকাটুলি' নামে একটি পাড়া। ব্রিটিশ সরকার টিকাটুলি পাড়ার বাসিন্দাদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে উচ্ছেদের মাধ্যমে গড়ে তোলে এখানে একটি খেলার মাঠ। শেষ বয়সে মুন্নি বেগম তাঁর সমুদয় অর্থ কোম্পানির হাতে তুলে দিয়েছিলেন বেশ কিছু শর্তের বিনিময়ে। সেই টাকার সুদ থেকেই চলত নবাব বাহাদুর স্কুল। স্কুলে অবশ্য বাংলা ও উর্দুতে শিক্ষা দেওয়া হত।

কাশিমবাজার : ইংরেজ কুঠির স্থল আজ অস্তিত্বহীন

স্কুলে রয়েছে তিনটি ছাত্রাবাস। হাজারদুয়ারির পাশে ইমামবাড়া। তার সম্মুখে এই স্কুল। শুধু তাই নয়, তাঁর গচ্ছিত অর্থেই নাকি হাজারদুয়ারির উন্নয়নও করা হয়।

তবে এ-কথা ঠিক, মুর্শিদাবাদের প্রধান আকর্ষণই হল হাজারদুয়ারি। আজকের হাজারদুয়ারি প্যালেস মিউজিয়াম। হাজার দরজার প্রাসাদ বলা হলেও এই প্রাসাদে কিন্তু নেই এক হাজার দরজা। আছে ৯০০ দরজা। বাকি ১০০ নকল দরজা। এই প্রাসাদে রয়েছে ১১৪টি কক্ষ। ৪১ একর জায়গা জুড়ে হাজারদুয়ারি কম্পাউন্ড।

হাজারদুয়ারি নির্মাণ করা হয়েছিল ইতালীয় স্থাপত্যকলায়। এর নকশা তৈরি করেন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের ব্রিটিশ স্থপতি স্যার ডানকান ম্যাকলয়েড। নির্মিত হয় নবাব হুমায়ুনজা'র আমলে। তিনিই এর নির্মাতা। ১৮২৯ সালের ২৯ আগস্ট নবাব হুমায়ুনজা তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিস বেন্টিকের উপস্থিতিতে এই প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ত্রিতল প্রাসাদের নির্মাণকাজ শেষ হয় ১৮৩৭ সালে। খরচ হয়েছিল ১৮ লাখ টাকা; যখন কিনা দু'আনায় রাজমিস্ত্রি ও পাঁচ পয়সায় মজুর মিলত। অতীতের নিজামত কেল্লায়ই তৈরি হয় হাজারদুয়ারি। প্রাসাদটি ৪২৫ ফুট লম্বা, ২০০ ফুট চওড়া ও ৪০ ফুট উঁচু। শোনা যায়, প্রাসাদটি নির্মাণের সময় চুন সুরকির গাঁথুনির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ ডিমের কুসুম, মৌরি ও খয়ের মেশানো জল ব্যবহার করা হয়েছিল। এমনকি প্রাসাদের প্রতিটি বড় খামের নিচে নাকি একটি করে সোনার ইটও দেওয়া হয়েছিল। হাজারদুয়ারি প্রাসাদ নির্মাণে সময় লেগেছিল ৮ বছর।

আজ হাজারদুয়ারি একটি মিউজিয়াম। এখানে সংরক্ষিত আছে নবাব-নাজিমদের নানা নিদর্শন। আছে হাতির পিঠের 'হাওদা', সুন্দর সুন্দর বজরা, স্ট্যাচু, পশমের কার্পেট। আছে সম্রাট বিক্রমাদিত্যের বল্লম, মীরকাশিমের ছোরা, সিরাজউদ্দৌলার তরবারি, সাতনলা বন্দুক, সিরাজকে যে ছোরা দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল সেই মোহাম্মদী বেগের ছোরাটি। আছে আলিবর্দী খাঁর তরবারি, নাদিরা শাহের বর্ম ও শিরস্ত্রাণ, মীরকাশিমের মুঙ্গের কারখানায় তৈরি বন্দুক, সম্রাট আকবরের ব্যবহৃত অস্ত্র, শেরশাহের লৌহ শিরস্ত্রাণ, ছোট ছোট কামান, বন্দুক, পিস্তল, নানা ধরনের কুঠার, বর্শা, ছোরা ইত্যাদি। আরও আছে মীরমদন পলাশীর প্রান্তরে যে কামানের গোলায় জখম হয়েছিলেন সেই কামানটিও। আরও রয়েছে ২ হাজার ৭৭০টি নানা ধরনের অস্ত্র, ১১ হাজার পুস্তক, ৩ হাজার ৭৯১টি দুর্মূল্য পাণ্ডুলিপি, নবাবী আমলের চিঠিপত্র এবং নানা চিত্রকলা। রয়েছে পশ্চিমা দেশের স্বনামধন্য শিল্পীদের আঁকা ছবি। সেই বি. হার্ডসেন, মার্শাল র‍্যাফেল, ভ্যান ডাইক প্রমুখের নামকরা চিত্র। আছে তৎকালীন স্বনামধন্য চিত্রকর হারু মাস্টার ও নবাব সাদেক আলী মির্জার অঙ্কিত ছবিও। এখানে রয়েছে বহু অয়েল পেইন্টিং, ওয়াটার কালারের ছবি, ফটোগ্রাফি, স্কেচ, স্ট্যাচু ইত্যাদি। এর মধ্যে 'দি বেবিয়াল অব স্যার জন মোর' তৈলচিত্রটি উল্লেখযোগ্য। এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় সেরা ছবি। অপরটি রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। রয়েছে 'আদম ও ইভ. সেন্ট মেরী'র ছবিও।

হাজারদুয়ারির প্রতিষ্ঠাতা নবাব হুমায়ুন'জা তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পী সাগর দাসকে দিয়ে তৈরি করেছিলেন হাজারদুয়ারির একটি মডেল। পরে সেই মডেলটি তিনি ইংল্যান্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়ামকে উপহার দিয়েছিলেন। এতে দারুণ খুশি হয়েছিলেন রাজা। রাজাও পাঠিয়েছিলেন একখানা তৈলচিত্র। সেইসঙ্গে হুমায়ুনজা'র 'রয়েল হ্যানোভারিয়ান' অর্ডার উপাধি।

হাজারদুয়ারির সামনে রয়েছে একটি ঘড়িঘর। মনুমেন্ট। ঘড়িটি এখনও আছে। মনুমেন্ট হিসেবে এটি এখন সংরক্ষণ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এটিও দেখবার মতো নিদর্শন। হাজারদুয়ারিতে গেলেই এটি চোখে পড়বে। বিশাল মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে।

মোহনলাল ছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি। বিশ্বস্ত যোদ্ধা। পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার পরও মোহনলালকে নিয়ে সিরাজ যদি যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেন জয় ছিল তাদের অবধারিত। কিন্তু তা হয়নি। মোহনলাল বারবার অনুরোধ করা

সত্ত্বেও সিরাজ যুদ্ধ ঘোষণা করেননি মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে। বিশেষ করে প্রধান সেনাপতি মীরজাফরই পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর অঙ্গীকার করে বেঈমানি করেছিল। সিরাজের সেই বিশ্বস্ত যোদ্ধা মোহনলালের বাড়ির আর কোনো অবশিষ্ট নেই। তবে আছে মোহনলালের বাড়ির ভিটা আর ভিটা সংলগ্ন বাঁধানো একটি পুকুর। এটি অবস্থিত লালবাগ ছায়াবাণী সিনেমা হলের পেছনে পূর্বদিকে কলন্দর বাগে। এটি আজও ইতিহাস খ্যাত সেই কাশিমবাজার। এই কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিতে একদিন সিরাজকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র হয়েছিল। কাশিমবাজার বহরমপুর শহরের কাছে। সেকালে এই কাশিমবাজার ছিল ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। নীল যেত ইংল্যান্ডে। ছিল ইংরেজদের কুঠিবাড়ি। এমন কথাও শোনা যায়, কাশিমবাজারে এতই ঘন ঘন দালানকোঠা ছিল যে, একের পর এক ছাদ ডিঙিয়ে ৮-১০ কিলোমিটার চলা যেত।

আজ অতীতের কাশিমবাজার তার ঐতিহ্য হারিয়েছে। ইংরেজদের সেই কুঠিবাড়ি নেই। ধ্বংস হয়ে গেছে কালের গর্ভে। সেই ধ্বংসস্তূপের উপর আজ গড়ে উঠেছে মনুষ্যবসতি। কথিত আছে, এক সময় ইংরেজ কুঠির সামনে স্টিমার ভিড়ত। এখান হতে নীল চালান হত। কাশিমবাজারে ছিল রেশমেরও রমরমা ব্যবসা। আজও কুঠিবাড়ির সামনের মাঠকে বলা হয় নীলমাঠ। এই নীলমাঠের পাশেই ছিল স্টিমার ঘাট। আজ সেই ঘাট নেই। কালের গর্ভে ভাগীরথী নদী শুকিয়ে গেছে। এখন খাঁখাঁ করছে নীলমাঠ। এক সময় এই কাশিমবাজার কুঠিতে ১৬৫৮ সালে জব চার্নক ৩০০ টাকা বেতনে সহ-অধ্যক্ষের চাকরিও করেছেন। ১৭৫৬ সালে সিরাজও জয় করে নিয়েছিলেন এই কাশিমবাজার।

কাশিমবাজারে রয়েছে দুটি রাজবাড়ি। বড়রাজা, ছোটরাজা। শোনা যায় আসল রাজা নাকি ছোটরাজা। বড়রাজা কান্ত মুদি তৎকালীন ইংরেজ কুঠিতে গোমস্তার কাজ করতেন। এই কান্ত মুদি নিজের বুদ্ধি দ্বারা ওয়ারেন হেস্টিংসয়ের মন জয় করে রাজা হতে পেরেছিলেন। হয়েছিলেন বিত্তশালী।

কাশিমবাজার রাজবাড়ি ও রেলস্টেশনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে ইংরেজদের একটি সমাধিক্ষেত্র। এখানে রয়েছে ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসয়ের প্রথমা পত্নী মেরি হেস্টিংস ও কন্যা এলিজাবেথসহ আরো বেশকিছু ইংরেজদের সমাধি। এখন এটি ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। প্রবেশপথেই সাইনবোর্ড। তাতে লেখা : রেসিডেন্সি সমাধি। 'এই সমাধিভূমি পলাশীর পরে যেসব ইংরেজ কর্মচারীরা কাশিমবাজারে বসবাস করিত, তাহাদের বাসস্থান। ইহার একটি ওয়ারেন হেস্টিংসয়ের (খৃ. ১৭৫৯) প্রথমা স্ত্রী ও কন্যা এলিজাবেথের। মৃত্যু তারিখ ১৭-৭-১৭৫৯।'

কাশিমবাজার রেলস্টেশনের নিকট কালিকাপুরে রয়েছে ডাচ বণিকদের সমাধিক্ষেত্র।

কাশিমবাজার : ইংরেজ কুঠি এখন অস্তিত্ব নেই

এটিও ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। ডাচ বণিকরা হীরা-জহরতের ব্যবসা করতে এখানে এসেছিল। এখানেও রয়েছে বেশকিছু ডাচ সমাধি। গেটে সাইনবোর্ডে। তাতে লেখা : 'ওলন্দাজ কবরখানা'। (প্রায় ১৮শ'-১৯শ' শতক)। 'ইহা ১৮২৫ খৃস্টাব্দে ওলন্দাজ উপনিবেশের অবসানের পর ইংরেজ অধিকৃত প্রাচীন কবরখানা। সমাধিফলকযুক্ত সর্বপ্রাচীন কবরটি ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে দেহান্তরিত স্যার কর্নেলিয়াস জোঙ্গের।'

মুর্শিদাবাদে রয়েছে বিশ্বাসঘাতক জগৎশেঠের বাড়ি। কাঠগোলার সন্নিকটে। হাজারদুয়ারি থেকে ৩ কিমি দূরে। প্রাসাদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় এখন ওখানে তার বংশধরেরা তৈরি করেছে অন্য একটি বাড়ি। এই বাড়ির কাছে জগৎশেঠ নাকি তৈরি করেছিলেন টাকশাল। যদিও জগৎশেঠের বংশধরা ওই বাড়িতে থাকছেন তবুও ওই বাড়ির নাম জগৎশেঠের বাড়ি হিসেবে পরিচিত। একতলা বাড়ি। জগৎশেঠের আসল নাম মানিকচাঁদ, ফতেচাঁদ। জগৎশেঠ তার উপাধি। তাঁর আসল বাড়ি রাজস্থানের যোধপুরে।

মুর্শিদাবাদে আরো আছে আরেক বিশ্বাসঘাতক উমিচাঁদের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। প্রাসাদ নেই। কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে রয়েছে তাঁর নির্মিত মন্দির। উমিচাঁদের মন্দির হিসেবে পরিচিত। শিব, কালী, গৌরাঙ্গ ও অন্নপূর্ণা মন্দির বর্তমান। উমিচাঁদের মূল প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে গেছে। জায়গাও বেদখল হয়েছে। মন্দিরের অনেক বিগ্রহও চুরি হয়ে গেছে। পলাশীর যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইভ যখন বিশ্বাসঘাতক উমিচাঁদকে লুটের মালের ভাগ দিতে অস্বীকার করে তখন এই উমিচাঁদ নাকি ক্ষণিকের জন্য হলেও উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।

মুর্শিদাবাদের রোশনীবাগে নবাব সুজাউদ্দৌলার সমাধিপ্রাঙ্গণের ঠিক সামনে রয়েছে একটি শিবমন্দির। নবাব আলিবর্দী খাঁর সময় যখন বর্গীরা বাংলাদেশের ধনসম্পদ লুটপাট করার জন্য হানা দিত, তখন মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিত কিছুদিন এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেন, আর একটি ঐতিহাসিক মন্দির রয়েছে মুর্শিদাবাদে। নাম কিরীটেশ্বরী মন্দির। এটি অবস্থিত ভাগীরথী নদীর পশ্চিমপাড়ে। ফার্হাবাগ থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে। জনশ্রুতি আছে, নবাব মীরজাফর বৃদ্ধ বয়সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে যখন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন তখন তিনি মহারাজ নন্দকুমারের পরামর্শে এই মন্দিরের চরণামৃত পান করেন।

লালবাগ হতে বহরমপুর আসার পথে কুঞ্জঘাটায় রয়েছে মহারাজা নন্দকুমারের বাড়ি। এখন এটির জীর্ণদশা। বাড়ির ওপরে ফলকে লেখা ঙঐবৎব ৎবংরফবফ গধযধৎধলধ ঘধহফধ কঁসধৎ রহ ১৭৭৫ অট্ট. এই মহারাজা নন্দকুমার নবাবী আমলে ছিলেন অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা। এ কারণেই তাকে মুর্শিদাবাদ থাকতে হত। তিনি যে প্রাসাদে অবস্থান করতেন তাকে বলা হয় মহারাজা নন্দকুমারের বাড়ি। যদিও এই বাড়িটি তাঁর নিজের নয়; জ্যেষ্ঠা কন্যার শ্বশুরবাড়ি। মহারাজা নন্দকুমারের নিজ বাড়ি ছিল বীরভূম জেলার ভদ্রপুরে। এই বাড়িতে রয়েছে নন্দকুমারের চিঠি, শাল, উত্তরীয়, অঙ্গবস্ত্র, বালাপোশ, তরবারিসহ কিছু ব্যবহৃত দ্রব্য। এই মহারাজ নন্দকুমারকে একটি ষড়যন্ত্র মামলায় আসামি করে প্রহসনমূলক বিচারে ফাঁসি দিয়েছিল ইংরেজরা।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে তাই মহারাজা নন্দকুমারের নামটি স্মরণীয়। তিনি তৎকালীন ইংরেজ বণিকদের চিনতে ভুল করে প্রথমে সিরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। পরে তিনি আবার ইংরেজদের কবল থেকে মীরজাফর ও তাদের বংশধরদের উদ্ধারের চেষ্টাও করেছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার ছিলেন নবাব মীরজাফর ও পরবর্তী নবাব-নাজিমদের আমলে দেওয়ান। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা ও প্রজ্ঞার জন্য ইংরেজরা তাকে দমন করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করেন। এই নন্দকুমার ছিলেন নবাব মীরজাফর ও পরবর্তী নবাব-নাজিমদের আমলে দেওয়ান। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা ও প্রজ্ঞার জন্য ইংরেজরা তাকে দমন করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করেন। এই নন্দকুমারই ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নানান অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকার

অভিযোগ আনেন। এতে ক্ষিপ্ত হন হেস্টিংস এবং জালিয়াতির মামলার অভিযোগ এনে প্রহসনমূলক বিচারে তাঁর প্রাণদন্ডের ব্যবস্থা করেন। খিদিরপুরের বধ্যভূমিতে মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদে সিরাজ-হত্যাকারী মহম্মদী বেগের উত্তরসূরিরা মুর্শিদাবাদে তৈরি করেছিলেন একটি মসজিদ। নাম ছিল বাগিচাপাড়া মসজিদ। এটি এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদে হিন্দু-মুসলমানরা একই সঙ্গে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতেন। এ কারণে শহরে যেমন মসজিদ তৈরি হয়েছে, তেমনি ছিল মন্দিরও। এখনও উল্লেখযোগ্য মন্দিরের মধ্যে রয়েছে কাশিমবাজারে নেমিনাথের মন্দির, মতিঝিলের পূর্বপাড়ে কুমারপাড়ায় রাধামাধব মন্দির, ডাহাপাড়ায় শ্রীশ্রী জগবন্ধু ধাম, বড়নগর রানী ভবানীর মন্দির, ভট্টবাটি গ্রামে ভট্টবাটির শিবমন্দির, নশীপুর আখড়া উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও রয়েছে নশীপুর রাজবাড়ি। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কুখ্যাত দেবী সিং এই রাজবাড়ি তৈরি করেন। দেবী সিং একসময় ডাকাত ও লুটেরা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। দেবী সিং মুর্শিদাবাদ এসেছিলেন সুদূর হরিয়ানা রাজ্যের পানিপথ থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে।

শোনা যায়, দেবী সিং বেনারসের মহারাজা চৈত্ত সিংয়ের বাড়ি লুট করে প্রচুর সম্পদ এনেছিলেন। এখন রাজবাড়ির ভেতরের মন্দিরে যে শ্বেতপাথরের গেটটি রয়েছে তাকে বলা হতো 'জাফরি গেট'। এটি সোনা-রুপো-মুক্তো দিয়ে জড়ানো ছিল। তিনি রুপো দিয়ে তৈরি করেছিলেন রথও। আরো শোনা যায়, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে তিনি প্রচন্ড লুটপাট চালিয়ে প্রচুর সম্পদ এনেছিলেন। প্রচুর রাজস্ব আদায় করে দেওয়ার সুবাদে ইংরেজরা তার ওপর দারুণ সন্তুষ্ট ছিল। এ কারণেই তিনি 'রাজা' খেতাব পেয়েছিলেন। বিশেষ করে বাংলা ১১৭৬ সালে বাংলার মারাত্মক দুর্ভিক্ষ যা '৭৬-এর মন্বন্তর হিসেবে পরিচিত, সেই সময় খাজনা আদায়ে তিনি প্রজাদের ওপর যে নিদারুণ অত্যাচার- উৎপীড়ন করেছিলেন তা আজও তুলনাহীন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর দু'পত্নী থাকা সত্ত্বেও তাঁর বংশরক্ষা হয়নি। পরে তিনি ভ্রাতুস্পুত্র বলবন্ত সিংকে 'দত্তক' গ্রহণ করেন। দেবী সিং মারা যান ১৮০৫ সালে। রাজবাড়ির গেটে বোর্ডে লেখা আছে: 'ঐতিহাসিক নশীপুর রাজবাড়ি। প্রতিষ্ঠা রাজা দেবী সিং। স্থাপিত ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ। এখানে আছে জাফরি বা পাথরের জল, তৈলচিত্র, রাজ প্যালেসের মডেল, অষ্টধাতু, কষ্টিপাথর ও শ্বেতপাথরের মূর্তি।'

এই নশীপুর রাজবাড়ির সন্নিকটে রয়েছে নশীপুর বড় আখড়া। এখানে রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুন্তগণ অবস্থান করেন।

নশীপুর রাজবাড়ির পেছনের দিকটায় রয়েছে সুন্দর একটি বাগানবাড়ি। কাঠগোলা। কাঠগোলা বাগান নামে পরিচিত। রয়েছে এর সিংহদ্বার,

কাটরা মসজিদের সামনের দিক

সুরম্য প্রাসাদ, পুকুর, জলসাঘর। আর পাশেই রয়েছে পরেশনাথের মন্দির। এটি নির্মাণ করেন লছমীবাত সিং। লছমীবাতের সঙ্গে ছিল বৃটিশদের মধুর সম্পর্ক। এখানে নাচগানের জলসা হতো। রয়েছে এখানে একটি রাজস্থানী স্টাইলের কুয়ো। কেউ কেউ আবার মনে করেন ওটি কুয়ো নয়: একটি সুরঙ্গ পথ। কাঠগোলায় গেলে গাইডরা ছেঁকে ধরে। ওরাই পর্যটকদের জানায়, ওটি সুরঙ্গ পথ। এখন ওটি ভেঙে নদীর সঙ্গে মিশে গেছে। মুখটি এখনো অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। তবে জলে পূর্ণ।

এবার আসা যাক পলাশীর প্রান্তে। ঐতিহাসিক পলাশী। ঐতিহাসিক এর আম্রকানন। যে আম্রকাননে ডুবেছিল বাংলার সূর্য। সেই আম্রকানন সম্পর্কে মানুষের জানার স্পৃহা প্রবল। জানতে চায় কোথায় সেই পলাশী প্রান্তর? ঐতিহাসিকের ধারণা, পলাশী মুর্শিদাবাদেই। আসলে তা নয়। পলাশী মুর্শিদাবাদের কাছে হলেও মুর্শিদাবাদ জেলায় নয়। মুর্শিদাবাদ থেকে মাত্র ৫৩ কিলোমিটার দক্ষিণে নদীয়া জেলায়।

এই পলাশীর সঙ্গে যেন আজ মিশে আছে বাংলার পরাজয়ের গ্লানি। পলাশী তাই অভিশপ্ত অনেকের কাছে। পলাশী মানেই পরাজয়, পলাশী মানে পরাধীনতা, পলাশী মানে বিশ্বাসঘাতকতার স্মারক। আজ সেই পলাশীর ঐতিহাসিক আম্রকুঞ্জ, যেখানে মঞ্চস্থ হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকদের সাজানো নাটক, সেই আম্রকুঞ্জ নেই। কালের চক্রে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছে রানী ভবানীর সেই আম্রকুঞ্জ। গ্রাস করেছে ভাগীরথী নদী। তবে শেষ আমগাছটির শুকনো গুঁড়ি ১৮৭৯ তে পলাশী বিজয়ের স্মারক হিসেবে চলে গেছে ইংল্যান্ডে। তবে এখানে রয়েছে একটি মনুমেন্ট। এটি ১৫ মিটার উঁচু। সংরক্ষণ করা হয়েছে চারদিকে প্রাচীর দিয়ে। মনুমেন্টের গায়ে লেখা আছে : 'Battle Field of Plassey. June 23rd, 1757,' কাছেই পলাশী সুগার মিল। আর মনুমেন্টের পাশে ডাকবাংলো।

মনুমেন্টটি এখন পলাশীর একমাত্র সাক্ষ্য। কারও কাছে পরাজয়ের স্মারক। বিশ্বাসঘাতকদের কাছে আবার বিজয়ের স্মারক। এই পলাশী মনুমেন্টটি আজ ভারত সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত। মনুমেন্টের পেছনে কিছুদূর হেঁটে গিয়ে বেড়িবাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে তাকালে একটু দূরে দেখা যাবে গাছপালার মধ্যে তিনটি সমাধিস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। এর প্রধান সমাধিটি হল সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মীরমদনের। পাশে রয়েছে আরও দুটি সমাধি। ডানদিকেরটি কমান্ডার বাহাদুর আলি খান ও বাঁদিকেরটি ক্যাপ্টেন নৌয়ে সিং হাজারার। বন্দুকধারী সেনাবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন বাহাদুর আলি খান ও গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন নৌয়ে সিং হাজরা।

সেনাপতি মীরমদন ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধের দিন দুপুর ২টায় কামানোর গোলায়, আগুন দিতে গিয়ে কামান ফেটে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। বকশী মীরমদন ছিলেন সিরাজউদ্দৌলার সেনাবাহিনীর গোলন্দাজ বাহিনীপ্রধান। তিনি নিহত হলে তার হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে গোপনে এই স্থানে সমাধিস্থ করেন। আজ এই তিন সৈনিকের সমাধি দেখতে পর্যটকরা আসেন। স্মরণ করেন বীর মীরমদনের কথা। পলাশীর প্রান্তরে মীরমদন, বাহাদুর খান ও নৌয়ে সিং হাজরার কথা।

এই পলাশী যেতে হলে যেতে হবে বাস বা ট্রেনে কলকাতা থেকে। বাসে গেলে নামতে হবে কলকাতা থেকে ১৭২ কিলোমিটার দূরে মীরা পলাশী বাস স্টপেজে। সেখান থেকে রিকশা বা ভ্যানে পলাশী মনুমেন্ট। মীরা পলাশী থেকে বাসও যায়, তবে সংখ্যায় খুব কম। ৪ কিলোমিটার দূরের পলাশী মনুমেন্ট বরং রিকশা বা ভ্যানে করে দেখাই ভালো। আবার ট্রেনে গেলে নামতে হবে পলাশী রেলস্টেশন। সেখান থেকে রিকশা বা ভ্যান পলাশী মনুমেন্ট।

এ কথা ঠিক- মুর্শিদাবাদে যেভাবে নবাবদের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে, তেমনি কিছুই নেই পলাশীতে। আছে শুধু মনুমেন্ট ও মীরমদনের সমাধি। তবুও এটা দেখার জন্য মানুষের আগ্রহ এতোটুকু কমেনি।

শেষ কথা

আজ সিরাজউদ্দৌলা নেই। কিন্তু তিনি বেঁচে আছেন মুর্শিদাবাদে। আর সেই সিরাজের টানেই আজ মানুষ যায়। স্মৃতি রোমন্থন করে। তাই মুর্শিদাবাদ আজও এক ইতিহাস। এ ইতিহাস কালজয়ী ইতিহাস। যতদিন মুর্শিদাবাদ থাকবে ততদিন মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে সিরাজ, মুর্শিদকুলি খাঁও থাকবেন। সেই ইতিহাসের পথ ধরেই আজও মুর্শিদাবাদ জাগ্রত।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এখনও জীবিত রয়েছেন সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফরদের বংশধরেরা। কেউ মুর্শিদাবাদে, কেউ ঢাকায়, আবার কেউ করাচিতে। কিন্তু নবাবী নেই কারো। সবাই বেঁচে আছেন ইতিহাসের ওপর ভর করে। ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরে।